Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-II, October 2019, Page No. 64-71
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য: সংজ্ঞা ও স্বরূপঃ তত্ত্ব ও পদ্ধতি

ড. প্রিয়ব্রত নাথ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, এস এস কলেজ, আসাম, ভারত

Abstract

Folklore studies became popular probably in the 19th century.It is an academic discipline related to many other disciplines. Folklore is basically the materials that is transmitted orally from one generation to another. It is such an important discipline these days, if anyone wants to acquire knowledge about a particular society. For proper study of folklore its theoretical part is also an important aspect. Present paper aims to discuss theoretical aspects of folklore and its various applications.

Key words : Folklore, Theory, Discipline, Academic, Society.

'Folklore' শব্দটিতে লোক সংস্কৃতির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা যায় কি না, এ নিয়ে পণ্ডিত গবেষকদের মধ্যে নানা মত রয়েছে। 'Folk' অর্থে লোক শব্দটি প্রায় সব বিশেষজ্ঞই গ্রহণ করলেও, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতিবিদরা ইংরেজী Folk শব্দটিকেই বাংলায় ব্যবহার করেন। তবে মতানৈক্য তৈরি হয়েছে 'Lore' শব্দটি নিয়ে। শব্দটি প্রাচীন ইংরেজিতে ছিল 'Lar' ডাচ ভাষায় 'Lier' জার্মান ভাষায় 'Lewre'। প্রাচীন টিউটোনিক ভাষায় শব্দটির মূল উৎস্য রয়েছে- যার অর্থ জ্ঞানদান বা আহরণ করা। পরে অর্থবিন্যাসে এর পরিবর্তন হয়- প্রাচীন বিশ্বাস, কাহিনি বা ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রভৃতি বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হলেও ধীরে ধীরে এর অর্থ দাঁড়ায় 'Wisdom of the folk'।

'Lore' শব্দটি নিয়ে মতানৈক্য তৈরি হলেও লোক সংস্কৃতি শব্দটিই 'Folklore' এর বাংলা প্রতিশব্দ রূপে এখন প্রচলিত। অবশ্য বিভিন্ন মনীষীরা এর বিরূদ্ধে তাঁদের মত দিয়েছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র 'Folklore' বলতে লোকযাত্রা কে বুঝিয়েছেন; আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন 'লোকযান'; সুকুমার সেন বলেছেন লোকচর্চা; মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন 'লোকবিজ্ঞান'; আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন 'লোকশ্রুতি'। এতসব মতপার্থক্য থাকলেও জনপ্রিয়তম শব্দ হিসেবে 'Folklore' এর প্রতিশব্দ হিসেবে লোক সংস্কৃতিই বর্তমানে প্রচলিত ও পরিচিত।

'Folklore' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন উইলিয়াম জন থমস তাঁর 'দ্য এথেনিয়াম' পত্রিকায় লেখা একটি চিঠিতে। এই ইংরাজি পরিভাষাটি সম্ভবত জার্মান 'Volkskunde' শব্দের অনুবাদ। কারণ জার্মান 'Volks' শব্দের সঙ্গে ইংরেজী 'Folk' শব্দের উচ্চারণগত ও অর্থগত সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এর সংজ্ঞা আর তাৎপর্য নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। মারিয়া লীচ এর 'Standard Dictionary of Folklore Mythology

and language' এ Folklore এর মোট কুড়িটি সংজ্ঞা সংকলিত। এর থেকে এর সংজ্ঞা সম্পর্কিত মতানৈক্যের স্বরূপটি বোঝা যায়। তবে এই সংজ্ঞাগুলি যে সবদিক থেকে পরিপূর্ণ তা বলা যায় না। আমেরিকান লোকসংস্কৃতিবিদ আর্চারটেলর 'The specific spectator' পত্রিকায় প্রকাশিত 'Folklore and the student of Literature' প্রবন্ধে Folklore এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে-

> "Folklore is the material that is handed on by tradition either by word or month or by custom and practice. It may be folksongs, folktales, riddles, proverbs, or other materials preserved in words. It may be traditional tools and physical objects like fences or knots, hot cross buns or eastern eggs; traditional ornamentation like the walls of tray or traditional symbols like the Swastika. It may be traditional procedures like the throwing of salt over one's shoulder or knocking on woods. It may be traditional belief like the notion that elder good for ailments of the eye. All these are folklore."[১]

সুতরাং বলা যায় ঐতিহ্যই লোকসংস্কৃতির মূল ভিত্তি। একই ভোগলিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা একটি নির্দিষ্ট গোষ্টির মানুষ শৈশব থেকে যে রীতি-নীতি, আচার-সংস্কারের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে সেই সংস্কৃতিই তার মজ্জাগত হয়ে যায়। এবং এই সংস্কৃতিই তার ঐতিহ্যে পরিণত হয়। এভাবেই লোকসংস্কৃতির ধারা সময়ের সীমানা পেরিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তীর দেওয়া লোকসংস্কৃতিয় সংজ্ঞাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক-

> "একই রূপ ভোগলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশে বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী যে আচার আচরণ জীবনচর্চা,সাহিত্য শিল্প ও ললিতকলা ইত্যাদির ঐতিহ্যানুযায়ী আনুশীলনে স্বাভাবিক পারঙ্গমতা অর্জন করে, তার আলোচনা, বিচার সংরক্ষণ, চর্চা প্রভৃতিই লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। যেমন লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকউৎসব, লোকশিল্প, লোকধর্ম, লোকসংস্কার, লোকসাহিত্য ইত্যাদি। অর্থাৎ এককথায় লোকসংস্কৃতি শব্দটির মধ্যে সমগ্র মানব সমাজের অন্তর্গত এক এক জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত হয়ে থাকে।"[২]

প্রায় একইরকম সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক দুলাল চৌধুরী

> "ফোক শব্দটির অর্থ লোক। লোক অর্থে মানুষজনও বোঝায়। মানুষজন বলতে এখানে বুঝতে হবে একাত্মক সম্প্রদায়, কোম শ্রেণির মানুষ, এক সংহত আত্মজ আদিবাসীগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীর বা লোকসমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মূলত বংশপরম্পরায় এক অবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক ধারায় প্রবাহিত।"[৩]

আদিবাসী গোষ্ঠীর কথা বলা হলেও এখানে মূল ভাবনা কিন্তু এক। নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় লোকসংস্কৃতি হচ্ছে

> "Folk a group of associated people, a primitive kind of post tribal social organization, the lower classes of common people of an area."[৪]

একটা বিষয় লক্ষণীয় যে প্রায় সব বিশেষজ্ঞই লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সংহত জনগোষ্ঠীর কথা বলেছেন। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে, লোকসংস্কৃতি মূলত সংহত জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীবদ্ধ জনসমাজের ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া জীবনচর্চা ও জীবনচর্যাই সেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি। অন্য ভাবে বলা

যায়- একই ভৌগলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক পরিবেশে বাস করছে এমন একটি নির্দিষ্ট সংহত জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া ও নিজেদের মধ্যে প্রচলিত মৌখিক সাহিত্য, শিল্প, প্রসাধন, প্রতীক, অনুষ্ঠান, আচার, ব্যবহার, ব্রত-পার্বণ, উতসব, মেলা, বিশ্বাস সংস্কার সবই হচ্ছে সেই সংহত জনগোষ্ঠীর লোকসংস্কৃতি।

চরিত্র ও গঠনপ্রকৃতি অনুসারে লোকসংস্কৃতিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়- (১)বস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতি ও (২) অবস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতি। মৌখিক সাহিত্য বা Verbal Art ছাড়া বাকি সবই হচ্ছে বস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতি। যেমন- পোশাক পরিচ্ছদ, লোকশিল্প, লোকভাস্কর্য, লোকাচার ইত্যাদি। অর্থাৎ বলা যায় লোকসাহিত্য হচ্ছে অবস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত। 'লোক' যদি হয় সংহত জনগোষ্ঠী, লোকসাহিত্য হচ্ছে সেই জনগোষ্ঠীর মুখে মুখে রচিত ও মুখে মুখে প্রচলিত সাহিত্য। লোকসাহিত্যকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়- (১) গদ্য নির্ভর লোকসাহিত্য, (২) পদ্য নির্ভর লোকসাহিত্য ও (৩) গদ্য-পদ্য নির্ভর লোকসাহিত্য। লোককথাকে আমরা গদ্য নির্ভর লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। ধাঁধা ছড়া, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত ইত্যাদি হচ্ছে পদ্য নির্ভর লোকসাহিত্য। আর লোকনাট্য কিংবা গীতিকাকে আমরা গদ্য-পদ্য নির্ভর লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। একটা বিষয় স্পষ্ট যে, লোকসাহিত্যই হচ্ছে লোকসংস্কৃতির সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বৈচিত্রময় শাখা।

লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এতে স্রষ্টার পরিচয় গৌণ, সৃষ্টি মুখ্য। অর্থাৎ লোকসাহিত্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়; সংহত সমাজের সৃষ্টি। তবে প্রথমে তা ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই রচিত হয়, পরে তা পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে নতুন রূপ লাভ করে সংহত সমাজের সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হয়। গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ মানুষই লোকসাহিত্যের মূল স্রষ্টা। তবে লোকসাহিত্য হতে গেলে যে তাকে গ্রামেই রচিত হতে হবে এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে গ্রামই যে লোকসাহিত্যের উর্বর ক্ষেত্র তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লোকসাহিত্যের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা কখনও লিখিতরূপে আত্মপ্রকাশ করে না। মুখে মুখে রচিত হয়ে তা মুখে মুখেই প্রচারিত ও প্রচলিত হয়। এছাড়া বলা বাহুল্য, ভাব ও প্রকরণের দিক থেকে লোকসাহিত্য অত্যন্ত সহজ ও সরল-জটিলতার অবকাশ নেই এতে। আরেকটি বিষয়ও লক্ষণীয় যে লোকসাহিত্যের একই বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন রচনায় আঙ্গিকগত কোন পার্থক্য নেই। যেমন দুই দুটি উপন্যাসের মধ্যে আঙ্গিকগত পার্থক্য থাকতে পারে।; কিন্তু দুই লোককথা বা লোকনাট্যের মধ্যে আঙ্গিকগত পার্থক্য দেখা যায় না।

গদ্যনির্ভর লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা লোককথার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন-

> "পুরুষ পরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ও গদ্যে বর্ণিত জনপ্রতিশ্রুতিমূলক গল্পকে লোককথা বলে।"[৫]

অর্থাৎ বলা যায়, 'লোক' যদি হয় একই ভৌগলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাসরত একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী, তবে সেই জনগোষ্ঠীর মুখে মুখে রচিত ও মুখে মুখে প্রচলিত গল্পকেই আমরা লোককথা বলতে পারি। দেশ কাল নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে যে গল্প শোনার আগ্রহ তা থেকেই সম্ভবত লোককথার উদ্ভব। নীতিশিক্ষা ও বিনোদন এর মূল উদ্দেশ্য হলেও; সামাজিক প্রয়োজন ও ধর্মীয় তাগিদও লুকিয়ে থাকে এর মধ্যে। অর্থাৎ বলা যায় লোককথায় সমাজ প্রতিবিম্বিত হয়। একটি সমাজের পারিবারিক, সামাজিক,

সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরা লোককথায় বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ লোককথা নির্দিষ্ট বিনোদনমূলক হলেও এর একটা ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক গুরুত্বও রয়েছে।

লোকসাহিত্যের অব্যাদ্য বিভাগের মত ধাঁধাও বেশ বিচিত্র ও সমৃদ্ধ। যে বাক্য দ্বারা একটিমাত্র ভাব রূপকের সাহায্যে জিজ্ঞাসার আকারে প্রকাশ করা হয় তাকেই ধাঁধা বলা হয়। এতে এলোমেলো বস্তুর ভাবনা সুসৎবদ্ধভাবে বাক্যের সংক্ষিপ্তরূপে প্রকাশ পায়। সংক্ষিপ্ততা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধাঁধার আবেদন মূলত বুদ্ধিগ্রাহ্য এর মধ্য দিয়ে উত্তরদাতার উপস্থিত বুদ্ধির পরীক্ষা করা হয়। ধাঁধার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তা যৌথভাবে উপভোগ্য বিষয়। এতে প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা দুয়েরই সমান ভূমিকা রয়েছে। ধাঁধার আবার বিভিন্ন বিভাগও রয়েছে। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ আর্চার টেলর তাঁর 'English riddles from oral tradition' গ্রন্থে ধাঁধাকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করেছেন-
(১) প্রাণী বিষয়ক (২) গাছপালা বিষয়ক (৩) মানুষ বিষয়ক (৪) গ্রহনক্ষত্র বিষয়ক (৫) বিভিন্ন কাজকর্ম বিষয়ক (৬) বুদ্ধির পরীক্ষা মূলক (৭) ব্যাক্তি সম্পর্ক বিষয়ক (৮) গাণিতিক অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে লোক সমাজের নিত্যদিনের বিষয়ই ধাঁধার মূল উপজীব্যঃ

লোকসাহিত্যের আরেক জনপ্রিয় শাখা প্রবাদ। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা যখন সীমিত পরিসর বাক্যে প্রকাশ করা হয় তাকে প্রবাদ বলে। মানুষের চরিত্রের সমালোচনা প্রবাদের অন্যতম লক্ষ্য। জীবনের কঠোর বাস্তবতা বোধ প্রবাদের অন্যতম ভিক্তি, তাই এর ভাষা খুব জোরালো ও প্রত্যক্ষ হয়। এতে বাচ্যার্থ নয়, ব্যঞ্জনার্থই মূল বিষয়। সামাজিক অভিজ্ঞতাঁর সাথে সাথে এতে কখনও কখনও নৈসর্গিক অভিজ্ঞতা ও প্রকাশিত হয়। একটা বিষয় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রবাদে যেরকম সমাজের বাস্তব রূপ প্রকাশ পায় তা লোকসাহিত্যের অন্য কোন শাখায় প্রকাশ পায় না।

ছড়া লোকসাহিত্যের আরেক সমৃদ্ধ শাখা। মূলত মুখে মুখে রচিত অন্দ্যমিলযুক্ত পদ্যকেই ছড়া বলে। ছড়ার উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন-

> "সভ্যতার প্রদোষলগ্নে আমাদের প্রাচীন পিতামহরা যখন বহু বিচিত্র দেবতাদের অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে স্তব-স্তুতি ইত্যাদি নিবেদন করতেন ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে ছড়ার উৎসারণের পথও খুলে যায়। অর্থাৎ আদিম মন্ত্রই কালের বিবর্তনে ছড়ায় পরিণতি লাভ করেছে।"[৬]

ছড়ার বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে ছড়াগুলি যেন এক বিচিত্র চিত্রের সমাহার। ছড়ার প্রত্যেকটি ছত্রেই যেন একটা একটা চিত্র প্রকাশিত হয়। একটি পংক্তির সঙ্গে আরেকটি পংক্তির অসংলগ্নতা ছড়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট। ছড়ার আরেকটি বিশেষ ছন্দ ও রয়েছে- যাকে বলে শ্বাসঘাত প্রধান বা স্বরবৃত্ত ছন্দ। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ছড়াও সমাজে ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য দলিল। শিশু মনস্তত্ত্ব, নারীর সামাজিক পারিবারিক অবস্থান তথা সমাজ ও ইতিহাসের নানা খুঁটিনাটি বিষয় ছড়ার অন্যতম প্রধান অবলম্বন।

লোকজীবনের আরেকটি দলিল হচ্ছে লোকসঙ্গীত। লোকজীবনের সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত হয় এতে। 'লোক' যদি হয় একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাসরত একটি জনগোষ্ঠী-

তবে বলা যায় এই 'লোক' এর রচিত সঙ্গীতই হচ্ছে লোকসঙ্গীত। বিষয় বৈচিত্রের দিক থেকে লোকসংস্কৃতি বিদরা লোকসঙ্গীতকে মোট তিনভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-
(১)আনুষ্ঠানিক (গাজনের গান, মনসা ভাসানের গান ইত্যাদি)
(২)ব্যবহারিক (বিয়ের গান ইত্যাদি)
(৩)কর্ম সঙ্গিত (ধানকাটার গান ইত্যাদি)
ভৌগলিক বৈচিত্রের দিক থেকেও লোকসঙ্গীতকে তিনভাগে ভাগ করা যায়-
(১)উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত (ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা ইত্যাদি)
(২)পশ্চিমবঙ্গের লোকসঙ্গীত (ঝুমুর, ভাদু, টুসু ইত্যাদি)
(৩)পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীত (ভাটিয়ালি, জারি, সারি ইত্যাদি)

উক্ত বিভিন্ন ধারার লোকসঙ্গীতের প্রায় প্রত্যেকটিরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও গায়নরীতি রয়েছে। একইসঙ্গে এই গানগুলিতে রচিয়তার সূক্ষ্ম সমাজদৃষ্টিও প্রতিফলিত হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ লোকসাহিত্যের এক উজ্জ্বল শাখা হচ্ছে লোকসঙ্গীত।

লোকনাট্য যেহেতু একাধারে দৃশ্য ও শ্রাব্য প্রয়োগকলা তাই লোকশিক্ষা বা সমাজ সচেতনাই দিক থেকে এর আবেদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোকনাট্যগুলো মূলত লোকজীবনকে অবলম্বন মুখে মুখে রচিত নাটক নাট্যকারের পরিচয় এখানে গৌণ থাকে। অনেক সময় লোকনাট্য তাৎক্ষণিক ভাবেও রচিত হয়। আধুনিক সাজসজ্জা কিংবা যন্ত্রসঙ্গীত কিছুই থাকে না এতে। সঙ্গীত প্রাচুর্য লোকনাট্যের আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লোকনাট্য হচ্ছে-
১) গম্ভীরা (মালদহ)
২) আলকাপ (মুর্শিদাবাদ)
৩) বনবিধি পালা (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)
৪) চোর চুরনি (জলপাইগুড়ি)
৫) কুশান (কোচবিহার) ইত্যাদি।

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের আলোচনায় যে সামাজিক আবেদনের কথা উল্লেখিত হয়েছে এর মধ্যে মনে হয় লোকনাট্যের আবেদনই সার্বাধিক। কারণ এর দৃশ্য ও শ্রাব্য গুনের সমান্তরাল উপস্থিতি লোকনাট্যকে একটা ভিন্ন মাত্রা দান করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের আলোচনায় এ সামগ্রিকতাও একটা বিষয় স্পষ্ট যে এর সঙ্গে সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যাশৃঙ্খলার সরাসরি যোগ রয়েছে। এককথায় বলা যায়, লোকসংস্কিতি ও লোকসাহিত্য একটি জাতির সামগ্রিক ইতিহাসকে নিজের মধ্যে ধারণ করে রাখে। সুতরাং এর অধ্যয়ন প্রক্রিয়াটাও বিজ্ঞানসম্মত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও অধ্যয়ণ যথাযথ ও বিজ্ঞানসম্মত হলে তবেই লোকসংস্কৃতি চর্চার মূল উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। এর জন্য লোকসংস্কৃতির গবেষককে ক্ষেত্রসমীক্ষা ও লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর সম্যক ধারণা থাকা খুবই জরুরী।

লোকসংস্কৃতি চর্চায় ক্ষেত্রসমীক্ষা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ লোকসংস্কৃতির প্রাথমিক উপাদান গুলো একমাত্র ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমেই সংগ্রহ করা সম্ভব। তবে যে কোনো রকম ক্ষেত্র সমীক্ষায় সঠিক ও

যথাযথ তথ্য সংগ্রহ সম্ভব নয়। সঠিক ও যথাযথ তথ্য সংগ্রহের জন্য সুনির্দিষ্ট ও বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। আগেই বলা হয়েছে যে 'লোক' হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীবদ্ধ জনগোষ্ঠী। এই 'লোক' এর সামগ্রিক জীবনধারার পরিচয় লাভ করাই করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে ক্ষেত্রসমীক্ষণ। আর এই ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খল রীতি লোকসংস্কৃতি বিদরা নির্ধারণ করেছেন। অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র লোকসংস্কৃতি ক্ষেত্র সমীক্ষাকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করেছেন। [৭]

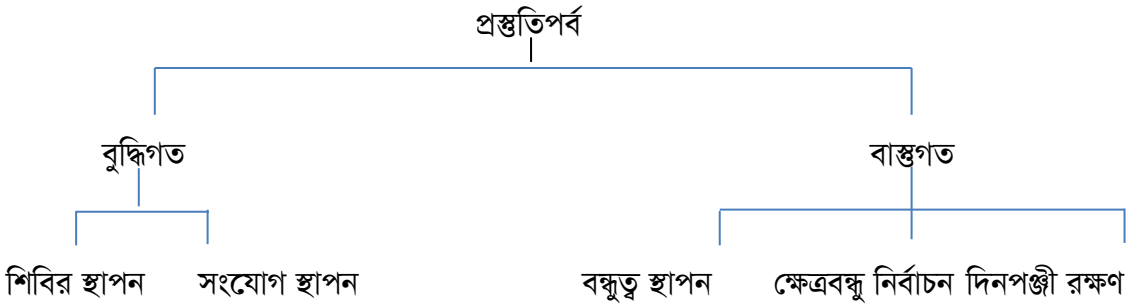

অর্থাৎ লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্র গবেষককে ক্ষেত্র গবেষণার প্রথমেই সেই গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি ঠিক করে নিতে হবে। গবেষণার স্থান, সময়, পরিধি ইত্যাদি আগে ঠিক না করে রাখলে গবেষণা সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য। শুধু তাই নয় সেই অঞ্চলের মানুষের ভাষা, শিক্ষা, আচার, ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থা ইত্যাদির ধারণাও করে নেওয়া প্রয়োজন। এই মানসিক প্রস্তুতির পর প্রয়োজন বস্তুগত প্রস্তুতির। অর্থাৎ প্রথমেই সেই নির্দিষ্ট জায়গায় গবেষক শিবির স্থাপন করতে হবে। কারণ একটা জায়গায় না থাকলে সেই অঞ্চলের মানুষের সার্বিক সাংস্কৃতিক পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। তবে শুধু শিবির স্থাপন করলেই হবে না, শিবির স্থাপন করার পাশাপাশি সেই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সংযোগও স্থাপন করতে হবে। আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হলে তবেই তাদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, আচারের পরিচয়ও লাভ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে ক্ষেত্রবন্ধু নির্বাচন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ যে অঞ্চলে গবেষক যাবেন সেই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সেই গবেষকের কোনো পরিচয় নাও থাকতে পারে, এই অবস্থায় একমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্রবন্ধুই সংযোগ সেতু হয়ে উঠতে পারেন। আর সবশেষে গবেষককে সংগৃহীত তথ্য গুলোর সুবিন্যস্ত ভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। পুরো প্রক্রিয়াটাই একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরনে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসৃত না হলে প্রকৃত তথ্য বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। অধ্যাপক শেখ মকবুল ইসলাম পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন- "পদ্ধতি হল জ্ঞানের বোধান্বয়নের বা অনুসন্ধানের ধারণা আর এই পদ্ধতি বিষয়ক জ্ঞানই হচ্ছে পদ্ধতিবিদ্যা। কোন বিষয়কে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাখ্যা করা হবে সেই বিষয়ের জ্ঞানই হচ্ছে পদ্ধতিবিদ্যা। ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত উপাদান বা তথ্য বিশ্লেষণের জন্য পদ্ধতিবিদ্যার সম্যক ধারণা থাকা খুবই প্রয়োজন। তা না হলে সংগৃহীত তথ্যাদির সঠিক বিশ্লেষন বেরিয়ে আসবে না এবং ক্ষেত্র সমীক্ষাও বিফলে পর্যবাসিত হবে। ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যগুলো বিশ্লেষণের জন্য যে পদ্ধতি গুলো বর্তমানে অনুসরণ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১) প্রাচীন অনুসন্ধিৎসাবাদ
২) তুলনামূলক পদ্ধতি

৩) ঐতিহাসিক ভৌগলিক পদ্ধতি
৪) জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি
৫) মার্কসীয় পদ্ধতি
৬) মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি
৭) নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি
৮) গঠন বিশ্লেষণ পদ্ধতি
উল্লেখিত পদ্ধতিগুলোর কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল-
(১) তুলনামূলক পদ্ধতি: ১৯২২ খ্রিশটাব্দে প্রথম এই তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন গ্রীম ভাইয়েরা। তাদের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল জার্মান ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা। গ্রীম ভাইয়েরা লোক কথার তুলনামূলক আলোচনা করে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মূল অন্বেষণ করতে চেয়েছেন। তাদের বক্তব্য ছিল যে, লোক কথাগুলি পুরাণ কথার অংশবিশেষ। তারা আরও বলেছিলেন যে, লোক কথাগুলি জার্মান ভাষা থেকেই পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে।
তুলনামূলক পদ্ধতির মূল অন্বিষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত প্রবাদ, ধাঁধা, ছড়া, লোকাচার ইত্যাদির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা। কীভাবে একই রচনা স্থান-কাল ও পরিবেশ ভেদে রূপান্তরিত হয়ে যায় এই পদ্ধতি আমাদের সেটিই দেখিয়ে দেয়।

(২) ঐতিহাসিক ভৌগলিক পদ্ধতি: এই পদ্ধতিটি তুলনামূলক পদ্ধতিরই সম্প্রসারিত রূপ। লোক কথার স্থানান্তরের সময় এর মধ্যে যে পাঠান্তর সৃষ্টি হয়; এই পদ্ধতিতে সেই পাঠান্তর সংগ্রহ করা হয়। সবশেষে তুলনামূলক অধ্যয়নের দ্বারা কাহিনির মৌল রূপ ও উৎস উদ্ধার করা হয়।

(৩) ঐতিহাসিক কস্তুবাদি পদ্ধতি: এই পদ্ধতির মূল ভিত্তি মার্কসবাদ। সমাজে সবসময়ই শোবক ও শোনিতের দ্বন্দ্ব বর্তমান। সম্পদের অসমবন্টনই এর মূল কারণ। লোকায়ত সমাজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি। তাই লোকায়ত সাহিত্য তাদের প্রতিবাদ, ক্ষোভ, না পাওয়ার বেদনা ইত্যাদি সবই ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন লোককথা, ছড়া, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত ইত্যাদিতে কীভাবে সেই শোষিত শ্রেণীর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে- এই পদ্ধতি সেটাই অধ্যয়ন করার চেষ্টা করে।

(৪) মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি: এই পদ্ধতিটি মূলত সিভামুণ্ড ফ্রয়েডের 'The Interpretation of Dreams' গ্রন্থের উপর ভিক্তি করে নির্ধারিত হয়েছে। ব্যক্তিসত্তার গঠন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফ্রয়েড 'Id' 'ego' এবং Super Ego র কথা উল্লেখ করেছেন। শুধু তাই নয় মানুষের মনঃস্তাত্ত্বিক বিকাশের প্রত্যেকটি স্তবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। মানুষের মনের এমনই একটি স্তর হচ্ছে 'অবদমিত যেঠন ভাবনা'। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার বিশ্লেষণে আমরা এই স্তরকে প্রয়োগ করতে পারি। এভাবে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মানুষের মনঃস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন স্তরের প্রকাশকে আমরা এই ফ্রয়েডিয়ান মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির আলোর বিশ্লেষণ করতে পারি।

(৫) নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি: লোকসংস্কৃতির বিচার বিশ্লেষণে আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি। কারণ নৃতাত্ত্বের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির একটা বিশেষ যোগ রয়েছে। মানবগোষ্ঠীর বিবর্তন নৃতাত্ত্বিক বিষয়। আর এই বিবর্তনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন পর্যায়। অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসংস্কৃতির বিশ্লেষণ করা হয় তাকেই নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি বলা যায়।

সার্বিক আলোচনায় দেখা যায় লোকসংস্কৃতি এমন একটা বিষয় যার সঙ্গে আমাদের বিদ্যায়ত্তনিক ও অবিদ্যায়ত্তনিক প্রায় সব বিষয়েরই যোগ রয়েছে। লোকসংস্কৃতির অধ্যয়ন আমাদের একটা সমাজ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে যেমন মতানৈক্যের শেষ নেই; তেমন এর শাখা প্রশাখায়ও বৈচিত্রের শেষ নেই। এই বৈচিত্রময় বিষয়ের অধ্যয়ন যে সাদামাটা হবে না তা বলাই বাহুল্য- তাই এর অধ্যয়নেও রয়েছে বিচিত্র সব তত্ত্ব ও পদ্ধতি এককথায় বলা যায়, সমাজকে নিবিড়ভাবে আত্মস্থ করতে হলে যে বিষয়ের অধ্যয়ন প্রয়োজন তা হচ্ছে লোকসংস্কৃতি।

তথ্যসূত্র:

১. আর্চার টেলবঃ 'ফোকলোর অ্যাণ্ড দ্য স্টুডেন্ট অব লিটারেচার', 'দ্য স্পেসিফিক স্পেক্টেটর', 'ভূমিকা', বরুণকুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোক সাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা,২০০৩,পৃ.১।

২. বরুণকুমার চক্রবর্তীঃ পূর্বোক্ত, পৃ.১।

৩. দুলাল চৌধুরীঃ 'বাংলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ' (সম্পাদিত) কলকাতা,২০০৪, ,পৃ.২৩।

৪.Charles Wrick: 'Dictionary of Anthropology' U.S.A., 1956, P.217.,(Source-Internet)

৫. ওয়াকিল আহমেদঃ 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ', বরুণকুমার চক্রবর্তী(সম্পাদিত), অর্পণা বুক ডিসট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৫, পৃ.৪৯৪।

৬. পল্লব সেনগুপ্তঃ 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০, পৃ.১৯৯।

৭. সনৎকুমার মিত্রঃ 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা', 'লোকসংস্কৃতি পদ্ধতিবিদ্যা বিশেষ সংখ্যা, সনৎকুমার মিত্র(সম্পাদিত), লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, ২০০২, পৃ.৫৩৭।

৮. শেখ মকবুল ইসলামঃ পূর্বোক্ত, পৃ.৫৪৫।